ব্যক্তি মানুষের অবলম্বন

মউলি মিশ্র

ঘিরে প্রশ্ন তুলি কোন অধিকারে?

স্কুল জীবনের শেষ দিকে আমার এক কবিতাপ্রেমী বন্ধু প্রশ্ন করেছিল, 'বাংলাদেশের কবিতা পড়েছিস?' আর আমাদের বাংলা মাধ্যমের স্কুল বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে কবিতা বলতে জানি রবীন্দ্র - নজল - ডি.এল. রায়ের কিছু প্রকৃতি, প্রতিবাদ আর দেশপ্রেমের কবিতা। কালিদাস রায়, মোহিতলাল কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। জসিমউদ্দিন 'এগজাম বোর্ডের' খুব ফেভারিট কবি। প্রতিবার ফাইনালে একটা প্রশ্ন মাস্ট.. এই বিদ্যে সম্বল, তাই বাংলাদেশের কবিতার সঙ্গে এ যাবৎ পড়া 'বাংলা কবিতা'র তফাৎ বুঝতে সময় লেগেছিল।সেই বোঝার প্রক্রিয়া শুরু হল যখন, স্বদেশপ্রেমের গোলা - বাদ কবিতা ছাপিয়ে একটা কবিতা খুব মুখে মুখে ফিরছে এখন। অসংখ্য ভাল কবিতা লিখেও কিছু কবি সারাজীবন পরিচিত হন তাঁর একটি কিংবা দু'টি মধ্যম মানের কবিতা দিয়ে। কিছু কবিতাও তেমনই, অসংখ্য গভীর পংক্তি ধারণ করেও একটি বিশেষ পংক্তি দিয়ে চিহ্নিত হয়। সেই ভাবেই, আল মাহমুদ ধরা দিলেন এই পংক্তি মাধ্যমে 'কবিতা তো মত্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আত্তার।' বইয়ের 'কবিতা তো মত্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আত্তার।' এই লাইনটাই মুখে মুখে ফিরছে বটে, কিন্তু সেনালি কাবিন বইয়ের 'কবিতা এমন' নামের কবিতায় আমাকে তখন ছুঁয়ে যাচ্ছে আরও অনেক পংক্তি, আর প্রতি বাক্যেই তো কবিতার এক - একটি সংজ্ঞা সাজানো। 'পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ' ...এ কখনও কবিতা সংজ্ঞা হতে পারে! প্রথমবার পড়ে এমন মনে হয়েছিল। এর থেকে বরং কবিতাকে 'ম্লান মুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর' ভাবা যতে পারে। 'চুলখোলা আয়েশা আত্তার' তুলনায় অনেক নিরাপদ। যে কোনও শ্রেণির পুষ পাঠকের কাছে পড়শি মেয়ের এলোচতুলের ছবিটি 'কবিতা' নামক ব্যাখ্যাতীত বিষয়ে অনুভব এনে দেবে। 'মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে জাল আর / বাঁশঝাড়ে বাধ্য ত্রীতদাস। কবে থেকে তিনি আমাকে এভাবে শাসন করতে শুরু করলেন? যবে আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সোনালি কাবিন' মিনিবুকটি সমরেশ মারফৎ পড়ে ফেলি। তারপর আমার ক্রমাগত চিঠির চাপে থানাপাড়া, কুষ্টিয়ার বন্ধু মুকুল খস (বর্তমানে অনেক দিনতাঁর সাথে যোগাযোগ নেই) একে একে পাঠাতে লাগলো আল মাহমুদের কবিতার বই -- লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালি কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, পাখির কাছে ফুলের কাছে। শব্দের কি নিপুণ ব্যবহার, কি তার জৌলুস, কিতার অব্যর্থ লক্ষ্য, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তে কি অনায়াস যাতায়াত দেশ পত্রিকাতে সেই ১৯৭১ -এ লেখা হয়েছিল জসীমউদ্দিনের তুলনায় তাঁর উপলব্ধির গভীরতা অতলস্পর্শী।

ঘুরিয়ে গলার বাঁক ওঠো বুনো হংসিনী আমার
পালক উদাম করে দাও উষ্ণ অঙ্গের আরাম
নিসর্গ নমিত করে যায় দিন, পুলকের দ্বার
মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।
কক্কার শব্দের পর আরণ্যক আত্মার আদেশ

আঠারোটি ডাক দেয় কান পেতে শোনোঅষ্টাদশী
আঙুলে লালিত করো বদ্ধবেণী, সাপিনী বিশেষ
সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।
ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দুটি জলের আওয়াজ---
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়
ঠোঁটের এ দ্রাক্ষারসে সিক্ত করো নর্ম কাকাজ
দ্রুত ডুবে যায় এসো, ঘূর্ণমান রক্তে ধাঁধায়।
(সোনালি কাবিন)

যাঁর মস্তিষ্কে, রক্তের ঘূর্ণ্যমান রক্তের ধাঁধায় এইভাবে প্রোথিত থাকে আল মাহমুদের শব্দের রেশ সেই প্রাকযৌবন থেকে সে কি করে বাস্তববাদী হতে পারে! বস্তুতঃ আমিও -- সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই নুহের নৌকায়/ অথবা উড়াল দিই অ াশার পাখিটি একা একা/ প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারা/ নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ের ঢেউয়ের যদি কোনদিন/ আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয়--- কোমল কৌশিক / দাণ বালুর বেগ, দিগবিজয়ী মাটির মহিমা।

বস্তুতঃ আমিও বাবু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো মনে করি --- 'সেটা এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকার্য নিশ্চয়ই বিধ্বর দ্বারা আরব্ধ হইয় াছিল। কিন্তু একবার প্রথম সৃষ্টি করিবার পর, নতুন জীবন বা জীব সৃষ্টি বিধি নিজে করিতে পারে নাই। এই কারণে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ অব্যাহত রাখিবার জন্য বিধিকে নিজের সৃষ্ট জীবন্ত জিনিসের ওপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সুতরাং জীবন্ত জিনিস বিধ্বর অংশ হইলেও, বিধির সৃষ্ট জিনিস হইলেও, বিধ্বর কাজ চালাইবার জন্য বিধ্বর কর্মচারী। বিধ্বর সহিত এই দুইরকমের সম্পর্ক বজায় না রাখিয়া জীবন্ত জিনিসের বা জীবের বিধ্ব থাকিবার অধিকার নাই।'

বস্তুতঃ কবি আল মাহমুদের কবিতা পড়তে পড়তে আমি এই বিধ্বর এক প্রকৃত কর্মচারী মারফৎ মহান প্রকৃতির সমস্পর্শ ল াভ করি। সেই স্পর্শ হতে পারে বিরিশিরির গহন অরণ্যে চাকমা মেয়ে ঘাসে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর' -- এ বার যে ছবিট া উঠে এল, গ্রামবাংলার সঙ্গে নাড়ির যোগ না থাকলে অনুভব করা মুশকিল। 'মাছের আঁশটে গন্ধ' কথাটা তখন আঠারে া বছরের ওপর চালাক স্বভাব নিয়ে পড়ায় কানে লাগছে। 'যেন মাছের গন্ধ ট্যালকম পাউডারের মতোও হতে পারে, আর তেমন হলে তা কবিতার প্রতিপাদ্য নয়!' খুব হেসেছিলাম বন্ধুরা। হেসেছিলাম তার পর আবার ফিরেছিলাম একই কবিত ায়। যত সময় গেছে, ততোই বুঝেছি, আঁশটে গন্ধঅলা জাল বিছানো রয়েছে উঠোনে, ঘাসের বন আর ঝাঁশঝাড় সব মিলেমিশে এক দাণ বিষাদ তৈরি করছে। যত বারই ওই লাইনে যাচ্ছি চোখ আটকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দিঘা - মেদিনীপুরের বাস নামিয়ে দিল মির্জাপুর স্টপেজে। আলপথ ভেঙে যাচ্ছি... পৌঁছলাম মেটে দেওয়ালের সেই বাড়িটায়। সন্ধে নেমেছে, জালটি তেমনই বিছানো উঠোনে। নাকে এসে লাগলো তীব্র আঁশ- গন্ধ মাছের গন্ধ! বইয়ের পাতা থেকে উঠে এল যেন। ধীরে ধীরে পড়া হল 'সোনালি কাবিন'। এই পরের অংশটাই এক কবির সঙ্গে এক পাঠকের সবথেকে জটিল এবং গভীর সম্পর্ক। কবিতায় যেমন ধরা পড়ছে, তার বাইরেও কবির একটা পরিচয় আছে। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর নীতিবোধ, তাঁর প্রেমভাবনা -- এই সবই কবিতায় যথাযথ না - ও প্রকাশ পেতে পারে। আর পাঠক অনেক সময়েই সেই বুদ্ধু প্রেমিক যে প্রেমাস্পদের সমস্ত স্তুতিই সত্য বলে মনে করে। কবিতায় যাঁকে চিনছি, তিনি যে ব্যক্তি কবির থেকে ভিন্ন এক সত্তা এটা নিজেকে বোঝানো খুব কঠিন।কারণ, আমরা যখন এক কবির অনেক কবিতা পড়ি, অনেক দিন ধরে পড়ি, তখন মনে হয়, ওই মানুষটাকেও আমি, হাবাগাবা কবিতা-পাঠক, দিব্যি চিনে গেছি। কিন্তু পাঠক চলে ডালে - ডালে, কবি চলেন পাতায় - পাতায়! তাঁকে বোঝা কি অতই সহজ? আর এই কঠিন কাজটারও কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কবিতা তো রইলই কবিতার জায়গায়। অবুঝ পাঠক তার আর কবিতার মাঝখানে বারবার কবিকে টেনে আনে। বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে। 'সমাজ সচেতন কবিতা পাঠক' - এর দল খুব হইচই করে বলে উঠল, 'এখনও আল মাহমুদ পড়িস? জানিস, উনি সাম্প্রদ ায়িক? ও দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে তাঁর আঁতাত আছে?' কিংবা 'বাংলাদেশের কবি হিসেবে ওঁর কবিতায় কখনও তেমন আত্মপরিচয়ের সঙ্কট লক্ষ করেছিস?' তা বিশেষ খেয়াল করিনি বটে। ও-পার বাংলার অন্য কবিদের লেখায় তা

অনেক বেশি প্রকাশিত। কিন্তু স্নিগ্ধ, শান্ত কবিতার অঙ্গনে এক ধরনের নিবিড়তা আছে। ভাল লাগে। এই সব স্বস্তি বাক্য পড়ার মাঝেই 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' কবিতার প্রথম পংক্তিতে পেলাম -- পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থটি বুকের ওপর রেখে/ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম/ ... সেই মায়াবী পর্দা দুলে উঠলো, যার ফাঁক দিয়ে / দৃশ্যই চোখে পড়ে, তোমরা বলো, স্বপ্ন। আল মাহমুদের 'কবিতা সমগ্র' - এর ভূমিকায় ১৯৮০ সাল জীবন সম্বন্ধে আমার অতীতের সর্বপ্রকার ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকেই পাল্টে দেয়। এমনকী সৌন্দর্যচেতনা ও কবিস্বভাবকেও।' এইখানে খটকা লাগল। মায়াবী পর্দার দোলন ভেদ করে চোখ চলে যেতে চাইছে কোনও অবাঞ্ছিত ঐক্যের দিকে। প্রায় অশীতিপর কবির সঙ্গে তারপর দেখা হয়ে গেল এই রকম হতে পারে, হতে পারে মনপবনের নাও। তাই যখন পড়ি---

চাকমা মেয়ে রাকমা/ ফুল গোঁজা না কেশে/ কাপ্তাইয়ের ঝিলের জলে / জুম গিয়েছে ভেসে/ জুম গিয়েছে ঘুম গিয়েছে/ ডুবলো হাঁড়িকুড়ি/ পাহাড় ডোবে, পাথর ডোবে/ ওঠে না ভুরভুরি।

বা যখন অবুঝের সমীকরণে

ও পাড়ার সুন্দরী রোজেনা/ সারা অঙ্গে ঢেউ তার/ তবু মেয়ে কবিতা বোঝে না।

তখন এক নিপুণ কারিগরের হাতে নারীর বিভিন্ন রূপ ফুটে ওঠা দেখি।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক! ট্রাকের মুখে আগুন দিতে/ মতিয়ুরকে ডাক।/ কোথায় পাবো মতিয়ুরকে/ ঘুমিয়ে আছে সে/ তোরাই তখন সোনামানিক / আগুন জ্বেলে দে।

পরমুহূর্তেই পড়ি

যে যাদুকর আমাকে একদা উড়াল শিখিয়েছিলেন যে মন্ত্র বলে আবার তা তুলে নিলেন। কিম্বা যেন আমারি ডানা আমার বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে পিঠে রয়ে গেল দগদগে ব্যথা।

অনাহুত, তাড়িতের মত কারো গাত্রে নুন স্পর্শ না করে আমি যখন কলকাতার একটি অন্ধকার গলি পার হচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদীদের ভোজসভার বাতি তখন জ্বলে উঠছে আর বুদ্ধদেব, ধনতন্ত্রের শেষ ভোজসভায় আপনি আমন্ত্রিত। (বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার) তখন আমরা পেয়ে যাই পুষের বিভিন্ন কৌণিক দিক। আর প্রকৃতি? আমার তো মনে হয় আল মাহমুদ যেন বাংলাদেশের প্রতিটি দূর্বা ঘাস নিজ হাতে ছুঁয়েছেন। আলাপ করেছেন উইচিংড়ে, কাঠবিড়ালী, বুনো শেয়াল এমনকী কাল কেউটে খরিসের সাথেও। তাই তিনি অনায়াসে লেখেন--- আমিতো নিসর্গগামী আমাকে চেনে না কেউ, আমিও চিনিনা।

হলুদ পাখির খোঁজে ঘুরি ফিরি, এমন সন্ধ্যায়। সোনার পালক তার, লাল চক্ষু গায় দিনযান আমি সেই পাখি চাই, আমি সেই অলীক গাছের শাখায় মেলবো চোখ অন্ধকার পাতার পৃষ্ঠায়।

২০০৪ -এর কলকাতা বইমেলায় কৃত্তিবাসের অনুষ্ঠানে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সারা পৃথিবীর বাঙালি এক করে এক ভাষা রাষ্ট্র গড়েছিলেন। তাতে তিনি রাষ্ট্রপতি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ, এক এক করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শু করে জসীমউদ্দিন পর্যন্ত মন্ত্রিসভা সাজিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কিন্তু অর্থমন্ত্রীর পদটি সেদিন পূরণ করেননি। আমি সেই পদটি কবি আল মাহমুদকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। কেননা শব্দের এত নিপুণ এবং অতলস্পর্শী অর্থ আর কারোর কাছে পাওয়া যাবে না। আর আল মাহমুদের লেখনী যতদিন সচল থাকবে ততদিন ঝিব্যাঙ্কের কাছে অর্থ সাহায্যেরও দরকার নেই। শহরে। তাঁর কবিতার বইয়েছাপা ছবির তুলনায় অনেক সৌম্য। তাঁর কবিতার মতোই শান্তছায়া রয়েছে মুখমণ্ডলে। ঝোলায় ভরে নিয়ে গিয়েছি প্রশ্ন। আকৈশোর জমানো প্রশ্ন। এক কবির কাছে এক পাঠকের প্রশ্ন। প্রথমেই মনে হল, এই যে বয়সের ভারে ন্যুব্জ কবি বসে আছেন আমার সামনে, আজও কি তেমন ভাবে ভালবাসতে পারেন ইনি? ' তেমন ভাবে ভালবাসা' মানে কি কে জানে! তাঁর কবিতায় খুব তীব্র কোনও শরীর ধর্মউঠে আসেনি কখনও। নিচচার প্রেম, তা ত্রমে ব্যাপ্ত হয়েছে, ঘিরেছে নিজেকে, প্রকৃতিকে, আল্লাহকেও। তবু, কবির প্রেম বলে কথা !সাধারণ মানুষের চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু! একদিন যে প্রেম কোনও - না কোনও ভাবে শরীরকেই জড়িয়ে থাকত, শরীরের তীব্র আকুতি সহস্র বর্ণে ধরা দিয়েছে কবিতায়, আজ কি তা বর্ণহীন? নিছক স্নেহ? কামনা নয় আর? এ প্রশ্ন কবির কাছে পাঠকেরই নয় শুধু। প্রাজ্ঞজনের কাছে তণেরও। ওই যে আমার সামনে বসে আছেন একজন। সময়ের দু'প্রান্তে দু'জন। উনি ভবিষ্যৎ। জানেন, প্রেমে

পরিণতি কী। তিনি বলেন, 'আমার তো মনে হয়, আমি এখন মানবীকেই নয়, সেই মানবীকে ঘিরে যে মাটি, যে অনুষঙ্গ সব কিছুকে। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ শেষে ঢাকা শহরের আকাশে চক্কোর দিচ্ছে আমার প্লেন, আমি নীচে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি আমার শহরকে, এখানেই প্রতীক্ষা করছেন নিজস্ব নারী। আমার ভালবাসার মানুষ। এত বছর পরেও এই অনুভূতিটাই মন শান্ত করে। এই-ই তো প্রেম।' সে দিনকবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, আজ করছেন ভালবাসাকে। আশ্বস্ত করছেন। ক্ষণজীবী ভালবাসার আয়ুও যে দীর্ঘ হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটুকুই তো জীবনের মানে বদলে দেয়! খচখচ করছিল, ভে াগাচ্ছিল যে সংশয়, মন খুলে প্রকাশ করি তাঁর সামনে আপনি সাম্প্রদায়িক? একটা পর্যায় পরে আপনি শুধুই কোর ানের নাম করছেন, নবীদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছেন... বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে ধর্মীয় মৌলবাদ সামাজিক ক্ষয়ের অন্যতম বড় কারণ, সেখানকার এক সচেতন মানুষ হিসেবে আপনার মনে হয় না, এটা... প্রশ্ন মাঝপথেই থমকে থ াকে। উনি চোখ বুজে আছেন। দুই হাত জড়ো করে মুখ ঢেকে বসে আছেন। নিবিষ্ট চিন্তায় ডুবে আছেন কোনও। তারপর বলতে থাকেন, 'কোথাও তো পৌঁছতে হবে কবিকে। আমি একটা গন্তব্যে পৌঁছতে চাই। যা আমাকে শান্তি দেবে, শুশ্রূষা দেবে। এই চাওয়াটা অন্যায়? তোমরা তো কখনও বল না, রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক? তিনিও তো তাঁর মতো করেই আ স্তিক্যবোধে নিজেকে - সঁপেছেন একটা সময়ে। বলো না, কারণ, তোমরা তাঁর বিশ্বাসের ব্যাপ্তিটাকে ধরতে পার। আমরটা পারছ না, সে হয়তো আমার প্রকাশেরই সীমাবদ্ধতা। কিন্তু ঈশ্বর বল, কোরানই বল আর ইসলাম, এ-ও প্রেমেরই মতো। এক - এক ভাবে আচ্ছন্ন রাখে, এক - এক ভাবে সেই আচ্ছন্নতার প্রকাশ ঘটে। আমি সাম্প্রদায়িক কি না, সে তোমরা ঠিক করবে। আমার কী দায়!' ঠিকই হয়তো। আমরা কোনও ব্যক্তি মানুষের অবলম্বন ঘিরে প্রশ্ন তুলি কোন অধিকারে? কেন সমাজ সংস্কারের দায় চাপিয়ে দিই কবির উপর? এ-ও কি এক ধরনের সঙ্কীর্ণতা নয়? কবিতার সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে অ াছেন কবি। আর এই দ্রবণ আমাদের ঘোরগ্রস্ত রেখেছে চিরকাল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com